রাজা রামমোহন



ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

রাজা রামমোহন

সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ্জ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২৪

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



রাজা রামমোহন

প্রথম পরিচ্ছেদ

গাছটিতে কেমন ফল হইবে, অঙ্কুর দেখিয়া তাহা যেমন বুঝিতে পারা যায় না, তেমনি, কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, পরম হিন্দু—বৈষ্ণব চূড়ামণি—শান্তস্বভাব কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশে ভবিষ্যতে একজন বিদ্যোৎসাহী ধর্ম্ম-সংস্কারক জন্মিয়া—তৎকালীন হিন্দু-সমাজের কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার সীমা-গণ্ডি মুছিয়া ফেলিয়া—ভারতবর্ষ হইতে বিলাতপর্য্যন্ত মাতাইয়া তুলিবে ? কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে ?

কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বাঙ্গালী ছিলেন না—তাঁহাদের বাস পশ্চিমে কনৌজ প্রদেশে। তাঁহারা প্রথমে সেখান হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গে আসেন, তারপরে আবার কর্ম্মোপলক্ষে সেখান হইতে মুর্শিদাবাদ ও তথা হইতে ক্রমে হুগলি জেলায় আসিয়া বাস করেন। বাংলা দেশের জল, হাওয়া ও মাটীর গুণে দুই চার পুরুষেই সেই পশ্চিমদেশবাসিগণ ক্রমশঃ বাঙ্গালী হইয়া উঠিলেন এবং হুগলি জেলার 'খানাকুল কৃষ্ণনগরের' কাছে 'রাধানগর' নামক স্থানে ঘর বাড়ী বাঁধিলেন। ক্রমশঃ দেশের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক একেবারে উঠিয়া গেল—সকলেই পুরাদস্তুর বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন, রাধানগর পৈত্রিক বাস্তুভিটা হইয়া উঠিল।

তখন এদেশের রাজা—মুসলমান। নবাব-সরকারে বিস্তর হিন্দু চাকরি করিতেন এবং নিজ নিজ কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া বড় বড় পদ পাইতেন। রাজপুরুষেরাও তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে

নানারকম খেতাব দিয়া রাজসম্মানে ভূষিত করিতেন। খেতাবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ এবং ক্ষমতা লাভ করিয়া তাঁহারা দেশের মধ্যে মান্য, গণ্য, সম্ভ্রান্ত হইতেন। এইরূপে অনেকে তখন 'চৌধুরী' 'রায়' 'খাঁ' প্রভৃতি হইয়া নামজাদা বড়লোক হইয়াছিলেন—এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশ সেই সকল গৌরবসূচক উপাধিতেই পরিচিত হইয়া থাকেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এইরূপে নবাব সরকারে চাকরি করিয়া নিজগুণে উচ্চপদ লাভ করেন এবং 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া মস্ত-বড় মানুষ হইয়া উঠেন। সেই হইতেই তাঁহার বংশে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধি লোপ পাইয়া 'রায়' উপাধি হইল এবং তারপর হইতে তাঁহার বংশধরেরা রায়বংশ বলিয়া পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র শৈশব হইতেই বড় সাধু—বড় নিষ্ঠাবান বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদের 'শাঁকাসা' গ্রামে। যেমন বিষ্ণুভক্ত আবার লেখাপড়াতেও তেমনি পণ্ডিত, স্বভাবেও—পরম ধার্ম্মিক, ন্যায়বান, সত্যনিষ্ঠ সাধুপুরুষ! সুতরাং ভগবান তাঁর গুণের পুরস্কার দিলেন।

পাতার আড়ালে ফুলটি গোপনে ফুটিয়া থাকিলেও যেমন তাহার গন্ধ তাহাকে ধরাইয়া দেয়, তেমনি গরীব গৃহস্থ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণের কথাও রাজপুরুষেরা শীঘ্রই জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে আনিয়া নবাব সরকারে চাকরি দিলেন। সেই হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল।

চাকরিতে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র শীঘ্রই আপনার গুণ এবং কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিলেন, তাহার ফলে তাঁহার খুব পদোন্নতি হইল এবং 'রায়' উপাধি পাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জনও যথেষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে সেই ধার্ম্মিকের স্বভাব বিগড়াইল না—তিনি পূর্ব্বের মতই শান্ত, নম্র, ন্যায়বান এবং সত্যবাদী রহিলেন। সেই সময়ে রাজ

সরকার হইতে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়া তাঁহাকে 'খানাকুল কৃষ্ণনগরে' বদলি করা হইল।

ভগবানের দয়ায় এত উচ্চপদ, ক্ষমতা ও অর্থলাভ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দিবারাত্রি কায়মনোপ্রাণে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। তাহার ফলে এইখানেই তিনি ইষ্টদেবতা 'গোপীনাথ জীউ'কে চাক্ষুস দর্শন লাভ করিলেন। তাঁহার প্রাণ-মন ভক্তিরসে ডুবিয়া গেল, সেই স্থান তাঁহার কাছে বৃন্দাবনের মত হইয়া উঠিল—সে স্থান ছাড়িয়া এক পদও অন্য কোথাও যাইতে আর তাঁহার মন সরিল না, তিনি সেইখানেই 'রাধানগর' নামক স্থানে বাড়ী করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই হইতেই তাঁহার বংশের বাস হইল—রাধানগরে।

কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র ছিল, তাহাদের সকলের ছোট 'ব্রজবিনোদ'। ব্রজবিনোদও পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং গুণবান ছিলেন। তিনি পিতার মত নবাব-সরকারে চাকরি করিয়া উচ্চপদ লাভ করিলেন এবং যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া পৈত্রিক ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তখন হুগলি জেলাটাময় রায়বংশের সুখ্যাতি ছাইয়া পড়িল, তাঁহারা সকলের কাছে অত্যন্ত মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত জমীদার হইয়া উঠিলেন।

ব্রজবিনোদের সাতটি পুত্র হইল—সকলেই রায়বংশের উপযুক্ত বংশধর। তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম যিনি তাঁহার নাম রামকান্ত রায়।

রামকান্ত রায় রায়বংশের গৌরব-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। কি লেখাপড়ায়, কি স্বভাবচরিত্রে, কি বুদ্ধি-বিবেচনায়, কি আচার-ব্যবহারে, তিনি সকল ভাইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন। বিশেষ তাঁহার অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি—শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তির মত—দেশের মধ্যে প্রবাদ-বাক্য হইয়া উঠিল। তিনি পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য নিজের 'কুল' ভঙ্গ পূর্ব্বক নীচু ঘরে বিবাহ করিয়া পিতার বাক্য রক্ষা করিলেন।

তখন রামকান্তের পিতা ব্রজবিনোদ রায়ের আসন্নকাল উপস্থিত—তিনি মৃত্যুশয্যায় শুইয়া হরিনাম করিতেছিলেন। সেই সময়ে শ্রীরামপুরের 'চাত্‌রা' গ্রামের শ্যাম ভট্টাচার্য্য আসিয়া কিছু প্রার্থনা করিলেন। মৃত্যুপথ যাত্রী ব্রজবিনোদ তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলুন আপনি কি চান?"

শ্যাম ভট্টাচার্য্য চালাক লোক, তিনি উত্তর দিলেন,—"আগে সত্য করুন যে আমি যা চাহিব—দিবেন।"

"যদি আমার ক্ষমতায় কুলায়।"

"অবশ্য।"

ব্রজবিনোদ—সরল, উদার, মহৎ, দানশীল—অত কথার মার-প্যাচ্ বুঝিতেন না, বিশেষ সেই শেষ সময়ে সংসারের প্রতি আকর্ষণ কমিয়া আসিয়াছিল, তিনি কিছুমাত্র ভাবনা-চিন্তা না করিয়া কহিলেন—"সত্য করিতেছি, যাহা চাহিবেন—দিব।"

তখন শ্যাম ভট্টাচার্য্য যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন, কহিলেন—"আমার কন্যার সঙ্গে আপনার এক পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে—আমি ইহাই চাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া পড়িল। রায়বংশ একে স্বভাব কুলীন, তায় পরমবৈষ্ণব, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভঙ্গ এবং শাক্ত সুতরাং রায়বংশের পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু ব্রজবিনোদ যে সত্য করিয়া ফেলিয়াছেন, তার উপায় কি? বংশ-গৌরব যতই ম্লান হউক—লোকে যতই নিন্দা করুক—সমাজ যতই ঘৃণা করুক—এ বিবাহ ত দিতেই হইবে, নহিলে যে তাঁহাকে সত্য-ভঙ্গ করিতে হয়। সত্য-ভঙ্গ করা মহাপাপ—এই মৃত্যুকালে কি তাঁহাকে সেই পাপের ভাগী হইয়া নরকস্থ হইতে হইবে?

ব্রজবিনোদ পুত্রগণকে ডাকিয়া একে একে সকলকেই ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে বলিলেন, কিন্তু কুলভঙ্গ এবং সামাজিক অপমান ও 'একঘরে' হইবার ভয়ে কেহই তাহাতে সম্মত হইল না। তিনি মহাফাঁপরে পড়িয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন—সত্যভঙ্গ হইবার ভয়ে চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল।

রামকান্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া সকল দেখিতেছিলেন এবং শুনিঁতেছিলেন। পিতার অবস্থা ভাবিয়া—তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া পিতৃভক্ত-পুত্রের প্রাণে যেন শেল বিঁধিল—তাঁহার কাছে সমাজ, লোক-লজ্জা প্রভৃতি অতি তুচ্ছ বোধ হইল, তিনি সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন—

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবা, আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিব।"

ব্রজবিনোদ যেন অকূলে কূল পাইলেন—প্রাণ খুলিয়া রামকান্তকে ঐকান্তিক শেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথাসময়ে রামকান্ত রায় শ্যাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা 'তারিণী দেবী'কে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলেন।

তারিণীদেবী সেকালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মেয়ে। ব্রাহ্মণের ঘরে যত রকমের পূজা-অর্চ্চনা, ব্রত-নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান হওয়া উচিত, সে সকলই তাঁর বাপের বাড়ীতে ষোল আনা রকম হইত। ছেলেবেলা হইতে সেই সব দেখিয়া—সেই রকমে চরিত্র গড়িয়া, তিনি পরম ভক্তিমতী, পবিত্রহৃদয়া ধার্ম্মিকা হইয়াছিলেন। সুতরাং রামকান্ত রায়ের সহিত তারিণীদেবীর মিলন—হর-পার্ব্বতীর মিলনের মত—রায়বংশের ভবিষ্যৎ গৌরববৃদ্ধির কারণ হইল।

ইঁহাদের পুত্র হইল, নাম রাখিলেন—'রামমোহন।' ইনিই ভবিষ্যতে 'রাজা রামমোহন রায়' নামে পরিচিত হইয়া দেশে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন জমীদারের পুত্র, সুতরাং তিনি সেই রকম ভাবেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। শৈশবে কখনো মামার বাড়ীতে, কখনো বাপের কাছে থাকিয়া সকলের নয়নের মণি হইয়া উঠিলেন।

একবার তিনি মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ শ্যাম ভট্টাচার্য্য নাতিটীকে কোলে পিঠে করিয়া বেড়াইতেন, নাতিও সকল সময়ে ঠাকুরদাদার সঙ্গী হইয়া শৈশবের নানারকম উপদ্রবে তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। কি পূজার সময়ে, কি বেড়াইবার কালে, কি আহারের সময়ে সর্ব্বদাই সে ঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত।

সেদিন ঠাকুরদাদা পূজায় বসিয়াছিলেন—নাতিটি কাছে বসিয়া দেখিতেছিল। পূজা শেষ করিয়া যেমন তিনি উঠিলেন অমনি সে গিয়া তাঁহার হাত ধরিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুরের প্রসাদী বেলপাতা নাতির হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নাতি কিন্তু সে আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝিল না, বেলপাতাটি ভক্তি-ভরে মাথায় না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ গালে পূরিয়া দিয়া চিবাইতে লাগিল। রামমোহনের মা সেইখান দিয়া যাইতে এ দৃশ্য দেখিলেন এবং তখনি তাড়াতাড়ি আসিয়া পুত্রের মুখে আঙ্গুল দিয়া বেলপাতা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর পিতাকে কহিলেন—"এ কি করিতেছেন বাবা? রামমোহন পরম বৈষ্ণব বংশের সন্তান, আপনি তাহাকে বেলপাতা খাওয়াইলেন—এ বড় অন্যায়!"

ব্রাহ্মণদের স্বভাব—একটুতেই চটিয়া আগুন হইয়া উঠেন, আবার একটুতেই শীতল হন। কন্যার কথা শুনিয়া—তাহার ধর্ম্মের গোঁড়ামী দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিলেন—"তোর এই সন্তান বিধর্ম্মী হইবে!"

এই তুচ্ছ ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে তাহা তারিণীদেবী স্বপ্নেও ভাবেন নাই। পিতার অভিসম্পাৎ শুনিয়া তাঁহার বুক কাঁপিয়া

উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

তাহা দেখিয়া বাপের মনে দয়া হইল, অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিল, তিনি কন্যাকে নানারকম প্রবোধ দিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিলেন, কহিলেন—

"আমি যা বলিয়াছি, বিফল হইবে না, কিন্তু চিন্তা নাই—ভাবিও না—তোমার এই পুত্র সংসারে অসাধারণ লোক হইবেন, দেশ-বিদেশে সকলের পূজা পাইবেন, উচ্চ রাজ-সম্মান লাভ করিয়া অমর নাম ও কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন!"

ঠাকুরদাদার সেই অভিসম্পাৎ এবং সেই আশীর্ব্বাদ রাম-মোহনের ভবিষ্যৎ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশবে বিদ্যাশিক্ষার সময় হইতেই মানুষ তার ভবিষ্যতের জীবন গড়িয়া তুলে। রামমোহনের ভবিষ্যৎ গৌরবের অঙ্কুরও তাঁহার শৈশব-জীবনে বিদ্যাশিক্ষার সময় হইতেই ফুটিয়া উঠিল।

পাঁচ বৎসর বয়সে 'হাতে খড়ি' হইবার পর হইতেই তাঁহার স্মরণশক্তি এবং প্রতিভা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহার পূর্ব্বে অতি শৈশবে—কখন কোথায় কি নূতন কথাটি শুনিয়া শিখিয়া ফেলিতেন, 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর' কথা একবার শুনিয়া জিজ্ঞাসামাত্রেই বলিতে পারিতেন, কোথায় কি নূতন জিনিষ দেখিতেন—সে কথা মনে জাগিত, এ সব দেখিয়া শুনিয়া লোকে চমৎকৃত হইলেও, যত বিস্মিত না হউক, হাতে-খড়ির পর হইতে তাঁহার স্মরণশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সকলেই অবাক্ হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত হাতেখড়ির দিনেই একবার দেখিয়া সমস্ত বাঙ্গালা বর্ণমালা শিখিতে না পারিলেও, তিনি আর এক প্রকারে তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিলেন। হাতেখড়ির দিন হইতে যেমন পাঠশালে গিয়া বাঙ্গালা শিখিতে লাগিলেন—সেই সময়ে—সেই পাঁচ বৎসর বয়সে—সেই সঙ্গে—বাড়ীতে আসিয়া আবার পার্‌সী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এক সঙ্গে এই দুইটি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতে সেই পাঁচ বৎসরের শিশু যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিল—জগতের ইতিহাসে তাহার আর দ্বিতীয় মিলে কি না সন্দেহ।

সারাদিন পাঠশালে আটক থাকিয়া ছেলেদের প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে, তাই ছুটি হইবামাত্রই তাহারা গৃহে ফিরিয়া খেলায় মাতে; অনেকে বই, শ্লেট, দপ্তর পর্য্যন্ত গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতে সময় পায় না। কিন্তু রামমোহন সে রকম হইলেন না, তাঁহার প্রকৃতি ভগবান যেন পৃথক্ বসিয়া গড়িয়াছিলেন।

পাঠশালা হইতে ফিরিয়া—খেলা দূরের কথা—অনেকদিন হয়ত খাবার পর্য্যন্ত না খাইয়া অমনি অন্য বই লইয়া বসিতেন। সারাদিন পাঠশালে বাঙ্গালা পড়িয়া আসিয়া তখন তাঁহার পার্‌সী পড়িবার ধূম পড়িয়া যাইত। অভিভাবকেরা খেলাইতে—বেড়াইতে কহিলে, তিনি সে কথা শুনিতেন না। বড় বড় বইগুলির রাশীকৃত পাতার মধ্যে কি যে স্বপ্নে-গড়া অনন্ত রহস্য লুকাইয়া আছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার মন ছটফট করিত, এবং কবে শীঘ্র শীঘ্র ছোট ছোট বইগুলি শেষ করিয়া বড় বড় বই পড়িতে পারিবেন কেবল সেই কথাই ভাবিতেন। এক দিনেই যেন সেগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলে তাঁর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়—এইরূপ সাগ্রহ দৃষ্টিতে তিনি পুস্তকগুলি দেখিতেন।

সুতরাং তাঁহার লেখাপড়ায় মনোযোগও সেইরূপ আকর্ষিত হইল। যেটা প্রাণ চাহে বালকেরা তাহাই করে, ভবিষ্যতে তাহাদের

স্বভাবও সেই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। লেখাপড়ায় সেইরূপ আশ্চর্য্য মনোযোগের ফলে তাঁহার ঐকান্তিকতা বাড়িল, তাহাতে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহা হইতে অধ্যবসায় জন্মিল। সুতরাং মানুষ হইতে হইলে শৈশবে যে সকল সাধনার আবশ্যক—মনোযোগ, পরিশ্রম, স্মরণশক্তি, ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি সমস্ত গুণরাশিই লাভ করিয়া তিনি ভবিষ্যতের মহা উন্নতির পথে চলিবার জন্য পা বাড়াইলেন।

ইহার ফলে, পাঁচ বৎসর হইতে আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—তিন বছরের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা ও পারসী উত্তমরূপ শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া কি হিন্দু কি মুসলমান পণ্ডিতগণ সকলেই অবাক্ হইয়া একবাক্যে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

তখনকার দিনে পারসী এবং আরবী ভাষাই এ দেশের রাজভাষা ছিল—ইংরাজীর সেই সবে সূচনা বলিলেও হয়। ঐ দুই ভাষাতেই অধিকাংশ কাযকর্ম্ম হইত। সুতরাং আরবী এবং পারসী ভাষা উত্তমরূপ শিখিতে না পারিলে কেহ কাহাকেও বিদ্বান্ বলিত না এবং ভাল রকম কর্ম্মকাযও জুটিত না।

বালক রামমোহন যখন সেই অল্প বয়সে উত্তমরূপ পারসী শিখিয়া ফেলিলেন, তখন সকলেই তাঁহার পিতাকে কহিল—"এ ছেলে ভবিষ্যতে একটি উজ্জ্বল রত্ন হইবে, এরূপ অমানুষিক শক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহার ভবিষ্যৎ নষ্ট না করিয়া, শীঘ্রই 'আরবী' শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন।"

কিন্তু আরবী শিক্ষার পক্ষে একটা মহা বাধা ছিল। তখন পাটনার মৌলবীগণই সেই বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, অন্য কোন দেশে সেরূপ শিক্ষক মিলিত না। সুতরাং আরবী শিখিতে হইলে পাট্নায় গিয়া শিক্ষা করিতে হইত।

রামমোহনের বয়স মাত্র নয় বৎসর। তাঁহার পিতামাতা বা অভিভাবকগণ সকলেই বাঙ্গালাবাসী—কর্ম্মোপলক্ষে বাঙ্গালাতেই থাকিতে হয়, পাটনায় আপনার বলিতে কেহই নাই। ঐ টুকু বালককে একাকী কেমন করিয়া সেই বিদেশে রাখিয়া আরবী ভাষা শিখাইবেন ?

এদিকে এমন অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিভাশালী বালকের শিক্ষার বন্দোবস্ত না করিয়া দিলে তাহার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। কে বলিতে পারে—হয়ত সেই প্রতিভা, সেই শক্তি বিপথে চালিত হইয়া সংসারের কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে! অতএব যেমন করিয়াই হউক বালকের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেই হইবে।

তাহার উপর আবার বালকের নিজের ঝোঁক! একখানি নূতন কাপড় কিম্বা একটি নূতন খেল্না পাইবার প্রত্যাশায় বালকেরা যেমন অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করে—আরবী শিখিবার কথা উত্থাপন হওয়া অবধি রামমোহন তেমনি ছট্‌ফট্ করিতে ছিলেন। কতদিনে পাটনায় যাইবেন—কবে হইতে সেই নূতন ভাষা আরবী শিখিবেন—তাহার জন্য বালক অস্থির হইয়া উঠিল। আহার নাই—নিদ্রা নাই—খেলা নাই—কেবল ঐ এক কথা। সকলেই বুঝিল বালকের এ আগ্রহ—এ উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গেলে সে মনে দারুণ নিরাশার কষ্ট পাইবে এবং হয়ত একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া অধঃপাতে যাইবে; যেমন করিয়া হউক, রামমোহনের আরবী শিখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

সুতরাং রামকান্তকে তাহাই করিতে হইল। বিস্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বালককে পাটনায় রাখিয়া আরবী শিখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নয় বৎসর বয়সে বালক রামমোহন পাটনায় গিয়া একজন বিখ্যাত মৌলবীর অধীনে থাকিয়া আরবী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইখানে বাস করিবার সময় হইতেই রামমোহনের জীবনে একটা প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল।

নয় বৎসর হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি পাটনায় মৌলবীর অধীনে থাকিয়া যেমন উত্তমরূপ 'আরবী' ভাষা শিখিলেন, তেমনি আর একদিকেও তাঁহার মতি গতি ধাবিত হইল। মুসলমানের পুস্তক পাঠে—অনবরত মুসলমানদের সঙ্গে থাকিয়া—তাহাদের সহিত আচার ব্যবহারে তিনি ক্রমে হিন্দুদের প্রতিমা পূজায় দোষ দেখিতে শিখিলেন এবং তাহার ফলে অবশেষে একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনার সাপেক্ষ হইয়া প্রতিমা পূজার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার প্রতিভা অদ্ভুত, সেই প্রতিভার বলে বার বৎসর বয়সের মধ্যেই বাঙ্গালা, পারসী এবং আরবীতে পণ্ডিত হইয়া তাঁহার যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি হইল, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি দেখাইয়া তর্ক করিবার শক্তিও তেমনি বাড়িল। তার উপর বক্তৃতা করিবার শক্তি অভ্যাস করাতে তাঁহার পক্ষে যেন সোনায়-সোহাগা হইল। সুতরাং যখন তিনি প্রতিমাপূজার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরবাদী হইলেন, তখন কেহ তর্ক-যুক্তি কিম্বা কথাবার্ত্তায় হারাইয়া তাঁহাকে আর হিন্দুদের দেব-দেবী পূজার পক্ষ করিতে পারিল না। সেই অবস্থায় আরবী পড়া শেষ করিয়া তিনি কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বার বৎসর বয়সে কাশীতে আসিয়া রামমোহন, অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক মনোযোগ এবং বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি শীঘ্রই সেই ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া ফেলিলেন।

পাটনায় বাস করিবার সময়ে কি ক্ষণে যে তাঁহার মনে প্রতিমা পূজার প্রতি অভক্তি এবং বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল—সেই হইতে তিনি কেবল ধর্ম্মচর্চ্চায় মন দিলেন। কোন্ ধর্ম্ম ঠিক—কোন্ ধর্ম্ম খাঁটি—কেমন ভাবে আরাধনা করিলে ঈশ্বরের কৃপালাভ হয়—কোন্ ভ্রমপূর্ণ ধর্ম্ম-পথে চলিয়া মানুষ কষ্ট পায়,—কোন্ ভাবে, কিরূপে ধর্ম্মচর্চ্চা করা উচিত—ইত্যাদি ব্যাপারের আলোচনার জন্য তিনি কাব্য, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি ছাড়াও সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসকল—পুরাণ, উপনিষদ, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি পড়িতে মন দিলেন। তাঁহার প্রতিভা—অদ্ভুত, পরিশ্রমের শক্তি—অসীম, সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই ঐ সকল কঠিন কঠিন বিষয়গুলিতেও তিনি পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ইহার ফলে তাঁহার অন্তরে সেই পূর্ব্বভাব আরও দৃঢ়তর হইয়া বসিল।

বেদান্ত পড়িবার ফলে প্রতিমাপূজার উপর দৃঢ় অশ্রদ্ধা স্থায়ী-ভাবে জন্মিল, উপনিষদ প্রভৃতি পাঠে চক্ষের সম্মুখে যেন নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল, সেই আলোকে তাঁহার অন্তরে ব্রহ্ম-জ্ঞান জাগিল।

এই সময়ে কাশীর ব্রাহ্মণগণের গোঁড়ামি এবং অত্যাচার প্রভৃতি দেখিয়া তিনি আরো হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিলেন। তাহাতে উপনিষদ এবং বেদান্ত পাঠের ফল তাঁহার অন্তরে পূর্ণমাত্রায় আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিবার সুবিধা পাইল।

প্রকৃত হিন্দুত্ব কি? যথার্থ হিন্দুর কি রকম হওয়া উচিত? বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, এই সকল যতই তিনি আলোচনা করিয়া স্থির করিতে লাগিলেন, ততই সেই কালের হিন্দু-সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া—তাঁহাকে ভয়ানক সমাজবিদ্বেষী করিয়া তুলিল। এদিকে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী এবং নির্ভীক প্রকৃতির লোক। সুতরাং অতিশয় বয়োবৃদ্ধের দোষ দেখিলেও তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাহাদের অন্যায় সহ্য হইল না। তিনি সামান্য বালক

হইয়াও তাহাদের মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন।

অল্পবয়স্ক বালককে কাশীর মত স্থানে বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহাদের দোষ ধরিয়া তর্ক করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সকলেই মনে মনে রামমোহনের উপর ভারি চটিয়া গেলেন; সকলেরই ইচ্ছা হইল যে তাঁহাকে সেখান হইতে দূর করিয়া দেন। কিন্তু সেই সকল বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের মধ্যে এমন বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য ও শক্তি কাহারও ছিল না, যে ন্যায়মত, শাস্ত্রমত যুক্তিতর্কদ্বারা হারাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। সুতরাং তাঁহারা কীল খাইয়া কীল চুরি করিতে লাগিলেন। মনে মনে বালকের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও শক্তির প্রশংসা করিয়া, বাহিরে তাঁহাকে 'নাস্তিক' বলিয়া, যেন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিয়া, মনের আপশোষ মিটাইতে লাগিলেন।

রামমোহন পণ্ডিতবর্গের এই রকম অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্যায় অত্যাচার কিছুতেই চুপ করিয়া সহিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণের মধ্যে ভগবান্ যে ব্রহ্মজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া দিয়াছিলেন সেই আলোকের সাহায্যে তিনি প্রকৃত ধর্ম্মরক্ষার জন্য নূতন পথ ধরিলেন।

তিনি দেখিলেন যে কেবল দুই চারি জায়গায় পাঁচজনকে জড় করিয়া হিন্দুদের দোষ দেখাইয়া মুখোমুখী তর্ক করিলে ফল হইবে না—সমস্ত দেশে দেশে এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে হইবে—তবে যদি হিন্দুদের এ কুসংস্কার দুর হয়। এই সব ভাবিয়া তিনি প্রতিমাপূজা উঠাইয়া দিবার জন্য—তাহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক দেখাইয়া—একখানি পুস্তক লিখিলেন। তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। পুস্তকে তাঁহার অসীম বিদ্যা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম ও জটিল ধর্ম্মতত্ত্বের সরল যুক্তিতর্কসকল প্রকাশ পাইল।

বড়মানুষের সন্তান--অর্থের অভাব বা অনাটন নাই—সেই প্রথম পুস্তক লিখিয়া তিনি প্রচার করিলেন। তাহাতে চারিদিকে একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল—রামমোহনকে 'নাস্তিক' 'বিধর্ম্মী' বলিয়া অনেকেই নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল।

তাহার পর সংস্কৃত পড়া শেষ করিয়া রামমোহন কাশী হইতে দেশে আসিলেন, এবং নিজের পুস্তক প্রচার ও তাঁহার মত চালাইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। তখন সকলেই তাঁহার নিন্দা আরম্ভ করিয়া নানা কথা কহিতে লাগিল।

বাপ-মা এবং আত্মীয়স্বজনগণের প্রাণে তাঁহার নিন্দা সহিল না, তাঁহারা তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইয়া সে সকল আলোচনা ত্যাগ করিতে কহিলেন এবং তাঁহার পুস্তকগুলি নষ্ট করিতে বলিলেন। কিন্তু রামমোহন তাঁহাদের কোন কথা শুনিলেন না। তখন তাঁহাকে শাসন করিয়া বশীভূত করিবার আশায় পিতা ভয় দেখাইলেন, কহিলেন, তিনি ধর্ম্মের তর্ক সকল না ছাড়িলে তাঁহারা বাড়ী হইতে তাঁহাকে দূর করিয়া দিবেন।

কিন্তু নির্ভীক, স্বাধীনচিত্ত, পণ্ডিত বালক রামমোহনের প্রাণে সে ভয় স্থান পাইল না। তিনি কাহারও কথায় কাণ না দিয়া আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া পরম বৈষ্ণব, গোঁড়া হিন্দু রামকান্ত রায় অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, এবং পুত্রের মায়া কাটাইয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

রামমোহন তাহাতেও টলিলেন না। ষোল বৎসরের বালক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া—বন্ধুবান্ধবের স্নেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাতর হইল না, ভয় পাইল না বরং আপনার উপর নির্ভর করা শিখিবার জন্য পরম উৎসাহে বুক ফুলাইয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। সেই আত্ম-নির্ভরতাই ভবিষ্যতে রামমোহনকে যশের উচ্চ-সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিল।

তখনকার দিনে এমন সব ভাল ভাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাজপথ ছিল না, রেলওয়ে-ষ্টীমারেরও ছড়াছড়ি হয় নাই, গোরু বা ঘোড়ার গাড়ীও বেশী মিলিত না। অধিকাংশ রাস্তাই জঙ্গলপূর্ণ সুতরাং ভয়সঙ্কুল ছিল। সেই সকল রাস্তায় আবার দস্যু তস্করের উপদ্রবও কম ছিল না। কাযেই দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করা বড়ই কষ্টকর এবং বিপজ্জনক ছিল।

কিন্তু ষোল বৎসরের বালক রামমোহন সে সকল কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া তিনি কেবল মাত্র নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া পায়ে হাঁটিয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ভ্রমণের ফলে তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং সমাজের কোথায় কোন্ কোণে আবর্জ্জনা রহিয়াছে, কি কারণে হিন্দু-সমাজ অবনতির পথে চলিয়াছে—সে সকল স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এই বহুদর্শিতা এবং বিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া তিনি নিজের ভবিষ্যৎ পথ ঠিক করিয়া লইলেন।

রামমোহন জমীদারের সন্তান—আজন্ম সুখের ক্রোড়ে পালিত, তথাপি সে দশায় পড়িয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। শারীরিক সকল কষ্টই নীরবে সহ্য করিতে শিখিলেন। আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করিলেন না, মহাযোগীর মত নশ্বর সংসারের সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র আপনার কর্ত্তব্য সাধনের উপায় করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বালক বয়সেই তিনি সুদূর তিব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দিনকতক সেখানে বাস করিবার পরেই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমাজের এবং ধর্ম্মের সকল ভ্রমপূর্ণ কুসংস্কারগুলি দেখিতে পাইল। তখন তিনি সে সকল নিবারণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

প্রতিমা পূজা, মানুষকে দেবতাজ্ঞানে পূজা, প্রভৃতি ব্যাপার

লইয়া, সেই সকল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে সেখানকার লোকেদের মধ্যে মহা আন্দোলন বাধাইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তখন সেখানকার সকলেই তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিল, এমন কি তাঁহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইল। কেবল কতকগুলি স্নেহপূর্ণ কোমলপ্রাণা রমণীর সাহায্যে সেবার প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। সেই হইতেই নারী জাতির প্রতি তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান বদ্ধমূল হইয়া গেল।

রমণীগণের দয়ায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে কিন্তু সেখানে সকলেই শত্রু, সুতরাং কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল; কিন্তু অটলহৃদয়, নির্ভীক ও দৃঢ়-চিত্ত রামমোহন তাহাতেও একটুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রাণের মায়া, দেহের কষ্ট, দেশবাসীর শত্রুতা—সমস্ত উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্রি কেবল আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রামমোহনের পিতা পুত্রের দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইলেন, তখন বাপের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না—তাঁহাকে বহুযত্নে তিব্বত হইতে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কুড়ি বৎসর।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া রামমোহন ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম, ঐকান্তিকতা এবং চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে অতি শীঘ্র ইংরাজী ভাষায় পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তখন একে একে হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, উর্দ্দু প্রভৃতি পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দশটা ভাষা শিখিয়া প্রত্যেক ভাষাতেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তখনকার কালে ঐরূপ সকল ভাষাতেই পরম পণ্ডিত এক রামমোহন ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না।

লোকে জীবনপাত করিয়াও একটা ভাষাতে পণ্ডিত হইতে পারে না—কিন্তু যুবক রামমোহন যৌবন কালের মধ্যেই দশটা ভাষাতে

মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। এমন কি বড় বড় বিদ্বান্ সাহেবেরাও তাঁহাকে একবাক্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার কাছে মস্তক নত করিতেন। ইহা বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে। ধন্য তাঁহার চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। এরূপ সাধনার অসাধ্য কি থাকিতে পারে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেশে ফিরিয়া রামমোহন যেমন নানা ভাষা শিখিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল ভাষার—সেই সকল জাতির ধর্ম্ম পুস্তকসকল পড়িয়া তাহার ভিতর হইতে প্রকৃত ও পবিত্র ধর্ম্মের তথ্য সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। জ্ঞান উপার্জ্জনে তাঁহার এমন প্রবল লালসা—প্রকৃত ধর্ম্মের সত্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে এমন আকুল আগ্রহ, যে তিনি আহার-বিহার, আরাম-বিরাম ভুলিয়া গেলেন—দিবারাত্রি পুস্তকে মগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার পাঠের শক্তি, অধ্যবসায়, চেষ্টা, পরিশ্রম, ঐকান্তিকতা প্রভৃতি গল্পের মত প্রবাদ বাক্য হইয়া দাঁড়াইল।

বাল্যকাল হইতে মানুষ যে রকম ভাবে চলে, বয়সকালে তাঁহাই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। রামমোহন বাল্যকাল হইতেই খেলা-ধূলা, গল্প-গুজব করা ছাড়িয়া, কেবল বিদ্যা-শিক্ষা এবং জ্ঞান-উপার্জ্জনেই মন দিয়াছিলেন, সুতরাং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বভাবও ঠিক সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পড়িবার স্পৃহা, পরিশ্রম করিবার শক্তি, ঐকান্তিকতা, আগ্রহ, চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় এরূপ বাড়িল যে ঠিক তাহা উপকথার গল্পের মত, শুনিয়া লোকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিল—মানুষ কি এ রকম হইতে পারে ?

বৃহৎ সাতকাণ্ড রামায়ণ রামমোহন এক দিনে শেষ করিলেন। তাও শুধু গল্পের ছলে পড়া নয়—প্রত্যেক শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিয়া, ভাব গ্রহণ করিয়া, ভাষার দোষগুণ ও সৌন্দর্য্য নির্ণয় করিয়া একেবারে অন্তরে গাঁথিয়া ফেলা! সকাল হইতে রামায়ণ লইয়া সেই যে দরজা বন্ধ করিয়া পড়িতে বসিলেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও উঠিলেন না,—আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ভুলিয়া গেলেন। বই শেষ করিয়া যখন বাহিরে আসিলেন, তখন বেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। এরূপ অক্লান্ত অধ্যবসায়, বিদ্যাভ্যাসে এরূপ যত্ন ও আগ্রহ না থাকিলে কেহ কি তাঁহার মত ভুবনবিখ্যাত পাণ্ডিত হইতে পারে? এরূপভাবে যিনি দেবী সরস্বতীর সাধনা করেন, দেবী কি তাঁহাকে জয়মাল্যে ভূষিত না করিয়া থাকিতে পারেন?

এইরূপ সাধনাতেই রামমোহন মায়ের পূর্ণ দয়া—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিলেন।

তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন স্বদেশেও তাঁহার কথা আর সহজে উড়াইয়া দিবার যো রহিল না। বিশেষ যখন তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্টায়ই ফিরিতেছেন, তখন তাঁহাকে শাস্ত্রালাপে হারাইয়া নিরস্ত করিবার জন্য হিন্দু-সমাজের অনেকের আগ্রহ জন্মিল। বিস্তর বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রের তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সকলেই চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন যে রামমোহনের বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যের কাছে তাঁহারা বালকমাত্র; কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না, সকলেই হারিয়া গিয়া মনে মনে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে লাগিলেন।

এইরূপে একজন পণ্ডিত আসিয়া হারিয়া গেলে, আবার আর একজন আসিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এইরূপ চলিতে লাগিল। একবার একজন পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা

এবং তর্ক করিতে চাহিলেন। রামমোহন শাস্ত্র-গ্রন্থ সকলই পড়িয়াছিলেন কিন্তু তন্ত্র পড়েন নাই—সুতরাং তিনি তন্ত্র-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না বা বুঝিতেন না।

পণ্ডিত আসিয়া যখন সেই তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা এবং তর্ক করিতে চাহিলেন—তখন তিনি হটিলেন না—মনে মনে ঠিক করিলেন এই নূতন বিষয়টি পড়িয়া তর্ক করিবেন। এই স্থির করিয়া পণ্ডিতকে পরদিন আসিতে বলিলেন, এবং সেই দিনই শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটী হইতে একখানি শ্রেষ্ঠ তন্ত্র চাহিয়া আনিলেন।

তাঁহার এরূপ আশ্চর্য্য মনের বল এবং আত্মনির্ভরের শক্তি যে একদিনের মধ্যে সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কঠিন তন্ত্রখানি আগাগোড়া চমৎকার রূপ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। পরদিন পণ্ডিত আসিলে তিনি অনায়াসে তাঁহার সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। কঠিন কঠিন সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সকল এরূপ চমৎকার ভাবে আলোচনা পূর্ব্বক তর্ক করিতে লাগিলেন যে তন্ত্রে রামমোহনের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া পণ্ডিত অবাক্ হইলেন এবং শেষে পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে এই সকল ঘটনায় বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যে সকলকে যতই হারাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে সমাজের ও ধর্ম্মের কুসংস্কার সকল দূর করিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মিল, তিনি যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে তর্ক করিয়া সমাজের ও ধর্ম্মের দোষ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

দেশে যেটা যুগ-যুগান্তর হইতে পুরুষানুক্রমে লোকের হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া গিয়াছে—সে সংস্কার সহসা দূর করা বড় সহজ কথা নয়। বাপ-ঠাকুরদাদা যাহা চিরকাল করিয়া গিয়াছেন—যে পথে চলিয়া গিয়াছেন—লোকে তাহাই করিতে চায়, সেই পথেই চলে। যদি কেহ কখনো

সেই সকলের মধ্যে দোষ দেখাইয়া দেয়, অমনি লোকের মনে বড় আঘাত লাগে, পূর্ব্ব পুরুষের নিন্দা ও অপমান করিতেছে ভাবিয়া সকলেই তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়া যায় এবং তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করে। রামমোহনের ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটিল।

প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি যখন বিস্তর দোষ দেখাইয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন, লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিল; কোন মনুষ্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে যখন নিষেধ করিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ বলিয়া দূর করিয়া দিতে লাগিল; তার উপর সতী-দাহ নিবারণের জন্য যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন তখন সকলেই তাঁহাকে সমাজের মহা অনিষ্টকারী শত্রু ভাবিয়া দমন করিতে চেষ্টা পাইল।

ক্রমে দেশে সকলেই রামমোহনের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় উত্ত্যক্ত হইয়া তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায়ের কাছে প্রত্যহ নালিশের উপর নালিশ আরম্ভ হইল। শেষে এমন ঘটিল যে পুত্রের জন্য অত বড় সম্ভ্রান্ত জমীদারকেও বুঝি একঘরে হইতে হয়।

তিব্বত হইতে পুত্রকে যখন ঘরে ফিরাইয়া আনেন, তখন রামকান্ত রায় মনে ভাবিয়াছিলেন যে, বিদেশে অশেষ দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া রামমোহন সাবধান হইয়াছেন, আর কখনও সেরূপ করিবেন না, কিন্তু এখন দেখিলেন—তাহা নহে, তিনি ছাই চাপা আগুন। দেশের সমস্ত লোকের শত্রুতা, পিতা-মাতা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের বিরাগ, অবিরত ঘৃণা, নিন্দা, লাঞ্ছনা—সমস্ত উপেক্ষা করিয়া বীরের মত—তিনি যখন সমান ভাবে নিজের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, তখন কেহই আর কোন রকমে তাঁহাকে সে পথ হইতে ফিরাইতে পারিবেন না। অমন অদ্বিতীয় গুণবান সন্তান যে এমন হইয়া যাইবেন, তাহাতে তিনি যত না দুঃখিত

হইলেন, পাছে সমাজচ্যুত হইতে হয় সেই ভয়ে ততোধিক ভীত হইয়া পড়িলেন।

পুত্রকে আর ঘরে রাখা চলে না, সে যখন কিছুতেই তাহার নিজের গোঁ ছাড়িবে না, কাহারও কথা মানিবে না, দেশের সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে একা বুক ফুলাইয়া চলিবে, তখন আর উপায় কি? কাযেই তিনি অমন পুত্রকে গৃহ হইতে আবার তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং একদিন লোক ডাকাইয়া—সকলের সম্মুখে রামমোহনকে দ্বিতীয়বার বিদায় করিয়া দিলেন।

এতদিন বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির ভয়ে রামমোহন বরং অনেকটা চাপিয়া চলিতেছিলেন, এক্ষণে—সকলের সম্মুখে দূরীভূত হইয়া তাঁহার সে ভয়, সে সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল, আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীরের মত সকলের বিপক্ষে একাকী সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দিবারাত্রি উচ্চকণ্ঠে তাহাদের দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, সতী-দাহ নিবারণ করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। বইয়ের উপর বই লিখিয়া নিজব্যয়ে ছাপাইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

ইহার ফলে দেশের লোক তাঁহার এমন শত্রু হইয়া উঠিল যে তাঁহাকে টিপিয়া মারিতে পারিলে তবে তাহাদের রাগ যায়। তবুও রামমোহন এক পদ টলিলেন না কিম্বা ভীত বা নিরাশ হইলেন না। ভগবানের উপর অটুট বিশ্বাস এবং আত্ম-শক্তির উপর ঐকান্তিক নির্ভর করিয়া চলিলেন—কে তাঁহার উন্নতির পথে বাধা জন্মাইতে পারে?

যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতে পারে, ভগবান পদে পদে তাহাদের সহায় হন। রাম-মোহনেরও তাহাই হইল। দেশের লোক শত্রু হইয়া তাঁহার নিন্দা রটাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতগণ, বড় বড় রাজপুরুষ এবং

পণ্ডিত সাহেবগণ তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভার যথেষ্ট আদর ও সম্মান করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহাতে রামমোহনের বল যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১২২০ সালে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। রামমোহন সমাজচ্যুত—গৃহতাড়িত হইলেও মনে মনে বড়ই পিতৃভক্ত ছিলেন, স্বাধীন হইয়াও পিতার সম্মান রক্ষার্থ সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছামত আপনার কর্ত্তব্য-পথে চলিতে পারেন নাই। এতদিনে তিনি যেন সকল বন্ধন কাটাইয়া উঠিলেন। মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মত প্রখর প্রভাবে, বিপুল অধ্যবসায়ের বলে সর্ব্বরকমে ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারে মন দিলেন। অষ্টপ্রহর চারিদিকে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার পুস্তক লিখিয়া নানাভাষায় ছাপাইয়া বিলাইতে আরম্ভ করিলেন। এতদিন যদিও বা দুই একজন আত্মীয় এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু সহায় ছিলেন—এখন সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

এমন কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্ত পুত্রের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। রামমোহন যেমন পিতৃভক্ত ছিলেন, মনে মনে মাতাকেও তেমনি মহাদেবী জ্ঞানে ভক্তি, সম্মান ও পূজা করিতেন। মা বিপক্ষ হইলে তাঁহার মনে বড় ঘা লাগিল, কিন্তু ভগবানের উপর বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরের ফলে তিনি শীঘ্রই শান্ত হইলেন। ভাবিলেন—জননীর এই ভ্রমপূর্ণ কুসংস্কার শীঘ্রই ঘুচিবে, তখন তিনি আবার তাঁহার স্নেহের ক্রোড়ে স্থান পাইবেন।

পিতার মৃত্যু হইলে রামমোহন যখন মহাপ্রতাপে সমাজের

সহিত সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াইলেন, তখন পাছে পৈতৃক অতুল বিষয়-সম্পত্তি বিধর্ম্মী পুত্র দখল করিয়া নষ্ট করে সেই ভয়ে আত্মীয় স্বজন বড়ই ভীত হইলেন, এবং রামমোহনের মাতাকে দিয়া পুত্রের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ রুজু করাইলেন—পুত্র বিধর্ম্মী, সে যেন পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি না পায়!

মাতা-পুত্রে মোকদ্দমা!—এ এক বিচিত্র ব্যাপার! কিছুদিন ধরিয়া সে মোকদ্দমা চলিল। প্রথমতঃ মনে মনে দারুণ ঘৃণায় রাম-মোহন ভাবিয়াছিলেন যে এ মোকদ্দমায় দাঁড়াইবেন না—বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তারপরে ভাবিয়া দেখিলেন, যদি তিনি সেরূপ করেন, এ মোকদ্দমায় হারিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি একেবারে লোপ পাইবে, কেহ আর তাঁহাকে মানিতে চাহিবে না। তাহাতে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির পথে বড় বাধা হইবে। তখন তিনি মোকদ্দমায় দাঁড়াইলেন। অবশেষে আদালতের বিচারে মাতা হারিলেন, তাঁহারই জয় হইল—তিনি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির অধিকার পাইলেন।

কিন্তু রামমোহন বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য সংসারে আসেন নাই। যে মহাব্রত লইয়া—যে সাধনার জন্য তিনি জন্মিয়াছিলেন, তাহাতে বিষয়-সম্পদ, ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁহার মোটেই লালসা বা ইচ্ছা ছিল না। তিনি সংসারের মঙ্গলসাধন করিতে আসিয়াছেন, একনিষ্ঠ যোগীর মত সকল উপেক্ষা করিয়া তাহাই সাধন করিয়া যাইবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র উচ্চ অভিলাষ। তিনি অর্থ-সম্পদ, বিষয়-বিভব লইয়া কি করিবেন?

রামমোহন মোকদ্দমায় জিতিয়া সমস্ত পৈতৃক বিষয়ের অধিকার লাভ করিলেন বটে, কিন্তু নিজে তাহা লইলেন না, সমস্তই ভক্তিভরে মাতার চরণে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন সকলেই তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

তিনি দেখিলেন যে সংসারে খুব মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত হইতে না পারিলে, উচ্চ-রাজপদে না বসিতে পারিলে, সহজে লোকে বশীভূত হইবে না। আর লোকে বশীভূত না হইলে তিনি কিছুতেই ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কার করিতে পারিবেন না। শুধু বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে এ কায হইবার নয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া তিনি কোন উচ্চ রকমের রাজকার্য্যে ভর্ত্তি হইবার ইচ্ছা করিলেন।

তখন 'ডিগ্‌বী' সাহেব রংপুরের কালেক্‌টার। রামমোহনের সহিত বিস্তর বড় বড় সাহেব সুবোর পরিচয় ছিল—তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর ভক্তি ও সম্মান করিতেন। ডিগ্‌বী সাহেবও তাঁহাকে ভালরকম চিনিতেন ও জানিতেন।

রামমোহন চাকরি করিবার ইচ্ছায় ডিগ্‌বী সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু সে দরখাস্তে লিখিলেন যে—চাকরি স্বীকার করিলেও—তিনি উপরওয়ালাদের কাহারও কাছে হীনতা স্বীকার করিবেন না, সকলের সঙ্গে তাঁহাকেও বসিবার জন্য সমানভাবে চেয়ার দিতে হইবে, তিনি কাহারও সম্মুখে সেলাম ঠুকিয়া ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না।

এই দরখাস্ত পড়িয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন। রামমোহনের বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। সেই যুবকের নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, আত্মসম্ভ্রম-বোধ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তখনই তাঁহাকে এক উচ্চ সম্মানের কার্য্য দিলেন।

চব্বিশ বৎসর বয়সে রামমোহন রাজকার্য্যে ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সত্যনিষ্ঠা, মনের বল, সৎসাহস সকলই অদ্ভুত রকমের। সেই সকলের সাহায্যে তিনি এমনভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন, যে বৃদ্ধ বহুদর্শী-রাজকর্ম্মচারিগণও সেরূপ পারেন না, সুতরাং

সরকার বাহাদুর শীঘ্রই তাঁহার গুণ বুঝিয়া—দিন দিন তাঁহার পদোন্নতির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার গুণে গবর্ণমেণ্ট আফিস সকলে ঘুষ লওয়া বন্ধ হইল, অত্যাচার অবিচার পলাইল, প্রজারা ধর্ম্মসঙ্গত ন্যায় বিচার লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল, চারিদিকে গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতি রটিল, নানাদিক হইতে বিনাপীড়নে, অতি সহজে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর আয় বাড়িল, সুতরাং সরকার বাহাদুর তাঁহার গুণের পুরস্কার দিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নত হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানের পদ পাইলেন। ইহাপেক্ষা উচ্চ ও সম্মানের পদ তখনকার দিনে আর ছিল না।

আর 'ডিগ্‌বী' সাহেব তখন তাঁহার অকপট পরম বন্ধু হইয়া উঠিলেন—এক দণ্ড তাঁহাকে কাছ-ছাড়া করিতে চাহিতেন না, সর্ব্বদা সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইয়া কায করিতে লাগিলেন। তিনি রামমোহনের এতই ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে তাঁহার লিখিত অনেকগুলি পুস্তকে নিজে ভূমিকা লিখিয়া দিয়া সে সকলের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। এই সময়ে রামমোহন অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া-ছিলেন, এবং দুইখানি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান হইয়া রামমোহন রামগড়, ভাগলপুর, রংপুর প্রভৃতি স্থানে রাজকার্য্যের জন্য বদলি হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। প্রত্যেক স্থানেই থাকিয়া তিনি যেমন অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজসেবা করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং লোকের সেবা করিতেও ছাড়িলেন না। প্রত্যেক স্থানে বাস-কালেই তিনি একটা করিয়া ধর্ম্মসভা স্থাপন পূর্ব্বক লোকের ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকে যেমন তাঁহার বিপক্ষ ছিল—এই উচ্চ রাজপদ লাভের ফলে এবং ধর্ম্মসভার স্থাপনে দুই এক জন করিয়া পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তি তেমনি তাঁহার দলে আসিয়া মিশিতে লাগিলেন।

এইরূপে তের বৎসর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিয়া তিনি ৩৭।৩৮ বৎসর বয়সে তাহা পরিত্যাগ করিলেন এবং দেশের, লোকের, সমাজের এবং ধর্ম্মের সেবায় কায়মনোপ্রাণ ঢালিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের যে আলোক কিশোর বয়সে তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রথম জ্বলিয়াছিল—এক্ষণে সেই আলোকে দেশের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া সত্য ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে হিন্দু-সমাজকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন। কর্ম্মবীর রামমোহন এইবারে প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেন।

দেশে আসিয়া এবার যখন তিনি সমাজ ও ধর্ম্মের যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন, তখন চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না—ববং মিত্রেরই সম্পূর্ণ অভাব ছিল, তবু তিনি কখনো বিচলিত হন নাই। এবার সেই সকল শত্রু একযোগে মিলিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, তথাপি তিনি মহাবীর ভীষ্মের মত অচল অটল ভাবে আপনার কর্ত্তব্য-পথে চলিলেন।

সকল ধর্ম্মই মূলে এক—এই কথাটা বুঝাইয়া লোকের মন হইতে সঙ্কীর্ণতা, অন্ধকার ও ভ্রান্তি ঘুচাইয়া দেশের লোককে যতই উদার, ধার্ম্মিক ও উন্নতিশীল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—ততই শত্রুরা বিধিমত প্রকারে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। তিনি যতই সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া বই লিখিয়া আপনার আদর্শ দেখাইয়া সকলের ভালর চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, লোকে ততই ক্ষেপিয়া উঠিতে লাগিল।

রামজয় বটব্যাল নামে এক ব্যক্তি প্রায় পাঁচ হাজার লোক জুটাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটা মস্ত দল বাঁধিল, এবং প্রত্যহ তাঁহার বাটীর চারিদিকে গো-হাড়, ময়লা প্রভৃতি ফেলিতে লাগিল, কাঁটা

ছড়াইতে লাগিল, মুরগী ছাড়িয়া দিতে লাগিল এবং আরো নানা প্রকারে জ্বালাতন আরম্ভ করিল। শেষে কিছুতেই না পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত পূর্ব্বক একটা ভয়ানক মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে একেবারে চিরকালের জন্য নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিল।

কিন্তু সত্য—চিরকালই সত্য, ধর্ম্ম—চিরদিনই বলবান, সৎ-উদ্দেশ্য ও নিষ্কাম পরহিতব্রত—চিরকালই জয়ী হইয়া থাকে। সুতরাং সে সবে রামমোহনের কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিল না। ধর্ম্মের বলে—সত্যের বলে—আত্মত্যাগের বলে তিনি আনায়াসে সে সকল কাটাইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাঁহার মা অত্যন্ত ভয় পাইলেন এবং পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্র-পৌত্রী সঙ্গে আর এক বাটীতে একত্রে বাস করিতে সাহস পাইলেন না। রামমোহন জননীর সে অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য পৈতৃক বাটী ছাড়িয়া—রঘুনাথপুরে আসিয়া বাড়ী করিলেন, এবং সেইখানে একটি বেদী প্রস্তুত করাইয়া তাহার সম্মুখে লিখিয়া দিলেন—"ওঁ তৎসৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং"।

সেই খানে বসিয়া তিনি উপাসনা ও ধর্ম্ম-প্রচার করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান 'ব্রাহ্মধর্ম্মের' সেই সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চল্লিশ বৎসর বয়সে রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলা সারকুলার রোডে বাড়ী কিনিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে নিজের বাড়ীতেই 'আত্মীয়-সভা' নাম দিয়া একটি সভা স্থাপন করিলেন—সেই সভায় বেদপাঠ, পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা এবং ভগবানের স্তুতি-গান হইতে

লাগিল। রামমোহন নিজে কতকগুলি পরম ভক্তিপূর্ণ ঈশ্বরতত্ত্বের গান রচনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন। সেই গানগুলিই সর্ব্বপ্রথম—'ব্রহ্মসঙ্গীত'।

রামমোহন রায়ের মত মহাক্ষমতাশালী, মহাপণ্ডিত, পরমসম্মান-ভাজন, উচ্চরাজ-সম্মান-প্রাপ্ত ধনী ব্যক্তি যখন কলিকাতার মত রাজধানীর বুকের উপরে সেই ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত সত্য তত্ত্ব বুঝাইতে ও বেদান্তের মতে ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন চির-কালের কুসংস্কারাবদ্ধ গোঁড়া হিন্দু-সমাজ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তাহারাও তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া সমাজের গোঁড়ামী বজায় রাখিবার জন্য এবং তাঁহার নব-প্রচারিত ধর্ম্মের মূল উৎপাটিত করিবার জন্য এক মস্ত সভা করিল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সেই সভার সভাপতি হইলেন এবং দেশ-বিদেশ হইতে মহামহা পণ্ডিত সকলকে আনাইয়া, রাম-মোহনকে তর্কে হারাইয়া, তাঁহাকে নিজেদের অধীন করিবার চেষ্টা পাই-লেন। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি সেই সময়ের দেশবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী রামমোহনকে শাস্ত্রতর্কে হারাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন।

দুই দলে ভয়ানক শাস্ত্রবিচার এবং মহা তর্কযুদ্ধ চলিল। একদিকে একা রামমোহন এবং তাঁহার পক্ষের জন দুইচার নগণ্য ব্যক্তি, অন্যদিকে সমস্ত ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী! তবু কেহই তাঁহাকে হারাইতে পারিল না—অবশেষে তাঁহারই জয় হইল। সেই শুভক্ষণ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় পতাকা সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় উড়িল।

এই ব্যাপারে জয়ী হইবার পর তখনকার দেশমান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্ ব্যক্তি রামমোহনের ধর্ম্মমতের সত্য তত্ত্ব বুঝিলেন এবং গোঁড়ামী ছাড়িয়া—প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের পোষণ করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহার দলে মিশিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজমোহন

মজুমদার, নন্দকিশোর বসু, কালীনাথ মুন্সী, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিই প্রধান।

ইঁহারা সকলেই বিদ্বান্, সম্ভ্রান্ত, ধনী, গণ্য মান্য, পূজনীয় ব্যক্তি —সকলেই দেশের ও সমাজের নেতা। সুতরাং রামমোহনের নব-ধর্ম্মের ভিত্তি খুব দৃঢ় হইল। তখন আনন্দে ও উৎসাহে মাতিয়া প্রথমে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, পরে চীৎপুর রোডের উপর বাড়ী করিয়া রামমোহন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপাসনা-মন্দির স্থাপন করিলেন। উহাই 'আদি ব্রাহ্ম-সমাজ'!

রামমোহন রায় যখন রংপুরে ছিলেন, তখন 'হরিহরানন্দ স্বামী' নামে এক পরমজ্ঞানী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তিনি আসিয়া সেই আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ' মহাশয়কে আনাইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য।

ইহা করিয়াই রামমোহন নিশ্চিন্ত রহিলেন না। যাহাতে দেশ হইতে প্রতিমাপূজা উঠিয়া যায়—সকলেই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করিতে চাহে—এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা চারিদিকে সভাসমিতি করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এ দেশের লোকের ইংরাজী শিখিবার সুবিধা হয়, চারিদিকে উত্তমরূপ শিক্ষা বিস্তার হয়, তাহার জন্যও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাহেব সুবো সকলেই রামমোহনকে সম্মান করিতেন, তাঁহার এই মহত্ত্ব এবং পরহিতব্রত দেখিয়া অনেকে আপন ইচ্ছায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। সুবিখ্যাত ডেভিড্ হেয়ার সাহেব এই রকম একটি সভায়, বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই হইতে রামমোহনের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্রতা হইয়া গিয়াছিল।

মানুষ একটা কার্য্যই জীবনে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারে না, কিন্তু রামমোহন একসঙ্গে অনেকগুলি কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন। যাহাতে দেশের লোক ভালরকম লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয়, যাহাতে সমাজের কলঙ্ক সকল মুছিয়া যায়, যাহাতে প্রাচীন কালের পাপজনক কুপ্রথা সকল নষ্ট হয়, যাহাতে লোকে বড় বড় সরকারী চাকরি পাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ও সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, যাহাতে কঠোর ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সহজ সরল ভাবে আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝিতে পারে, যাহাতে দেশের লোক স্বাধীনচিত্ত, ধার্ম্মিক, আত্মনির্ভরসম্পন্ন এবং উন্নতিশীল হয়, তাহার প্রত্যেকটির জন্য তিনি আমরণ অক্লান্তভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এরূপ পরহিতব্রতধারী, এরূপ নিষ্কাম আত্মত্যাগী, এরূপ পরের দুঃখে কাতর, এরূপ পরচিন্তাপরায়ণ সাধুপুরুষ অতি অল্পই দেখা যায়।

অনেক লোকের স্বভাব কাহারও ভাল দেখিলেই হিংসা হয়। সে ব্যক্তি উপকার করিতেছে—এ কথা মনে মনে বুঝিতে পারিলেও তাহা মুখে স্বীকার না করিয়া বরং তাহার নিন্দা রটনা করে। রাম-মোহন যখন সহস্র বাধা বিঘ্ন শত্রুতা কাটাইয়া ধীরে ধীরে আপন কর্ত্তব্য সাধিয়া যাইতে লাগিলেন, যখন তাঁহার প্রভাব লোকসমাজে কতকটা আধিপত্য চালাইল, তখন এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক 'বিধর্ম্মী', 'নাস্তিক', 'নূতন ধর্ম্ম-স্থাপক' প্রভৃতি বলিয়া তাঁহার নিন্দা রটাইতে আরম্ভ করিল। তখন তিনি পুস্তক লিখিয়া এবং প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে সরলভাবে কহিলেন যে তিনি—পরম হিন্দু, বিধর্ম্মী বা নূতন-ধর্ম্ম প্রচারক নহেন। পবিত্র, আদি, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, যাহা—দেবর্ষি নারদ, রাজর্ষি জনক, ব্যাসদেব, বশিষ্ঠ, শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মগণ বুঝিয়া এবং অনুষ্ঠান করিয়া ধন্য হইয়াছেন—তিনি তাহাই সকলকে সরল ভাবে বুঝাইয়া কুসংস্কার সকল নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন—সকলকে

সেই পূতধর্ম্ম পথে চালাইয়া সংসারে পুণ্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন—ইতরভদ্র, ছোটবড় সকলকেই সেই ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম ও উপাসনার সহজ উপায় বুঝাইয়া এবং শিখাইয়া দেশের লোকের এবং সমাজের মঙ্গল সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রামমোহন যতগুলি পুস্তক লিখিলেন কেবলমাত্র সেইগুলি একত্র করিলেই একটা লাইব্রেরী হইতে পারে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্য প্রভৃতি, ধর্ম্মগ্রন্থের ভিতর দিয়া চালাইঁয়া তিনি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিলেন বত্রিশখানা এবং ইংরাজী পুস্তক লিখিলেন আটত্রিশখানা—মোট সত্তর খানা পুস্তক। এরূপ ব্যাপার আর কেহ কখনও করিতে পারিয়াছেন কি? সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শনশাস্ত্র, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার আশ্চর্য্য রকম অধিকার; তিনি সকল বিষয়েই রাশিরাশি চমৎকার চমৎকার রত্নবিশেষ পুস্তক লিখিয়া দেশের, দশের ও ভাষার উন্নতির সূচনা করিয়া দিয়াছেন। একাধারে এরূপ সর্ব্বশক্তিমান ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ কোন্ দেশে আর কয় জন জন্মিয়াছেন বলিতে পারি না।

শ্রীরামপুরে তখন পাদরি সাহেবদের প্রধান আড্ডা ছিল। সেইস্থান হইতে তাঁহারা 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নামে সংবাদপত্র প্রচার করিতেন। সেই সংবাদপত্রে রামমোহনের নামে নানারূপ অন্যায় কথা প্রায়ই লিখিত হইত। তিনি তখন নিজের নাম গোপনপূর্ব্বক 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' নাম দিয়া লিখিত 'ব্রাহ্মণ-পত্রিকা' নামক এক পত্রিকা প্রচার করিলেন। তাহাতে 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র নিন্দাপূর্ণ ভ্রান্ত মত সকল খণ্ডন করিতে লাগিলেন।

তারপর সমাচার চন্দ্রিকা যখন হিন্দুদের দোষ দেখাইয়া কুৎসা করিলেন, ব্রাহ্মণপত্রিকাও অমনি খৃষ্টান্‌দের অধিক দোষ দেখাইয়া দিতে

লাগিল—এইরূপে দুই পত্রিকায় অনবরত ধর্ম্ম ও সমাজনীতি লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল—সকল যুদ্ধেই দশভাষায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-পত্রিকাই জিতিতে লাগিল। তখন সকলেই বুঝিল যে—নকল শিবপ্রসাদ শর্ম্মা—স্বয়ং রামমোহন! তখন হইতে অনেক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক রামমোহনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। তথাপি, তিনি যথার্থ বীরের মত অচল অটল ভাবে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শাস্ত্রের দোষগুণ নির্ণয়পূর্ব্বক কাগজে লেখার যুদ্ধে জয়ী হইয়া রামমোহনের নাম বিলাতে পর্য্যন্ত বিখ্যাত হইয়া পড়িল। গোঁড়া হিন্দুদের মত যেমন অনেক গোঁড়া খৃষ্টান সাহেব তাঁহার বিপক্ষ হইলেন, তেমনি আবার প্রকৃত খৃষ্টান, যথার্থ পণ্ডিত অনেক ধর্ম্মপ্রচারক সাহেব রামমোহনের গুণ ও শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বন্ধু হইলেন। ইংরাজী সুবিখ্যাত সংবাদপত্র "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া গেজেট-"এর সম্পাদক লিখিলেন যে—"ধর্ম্মযুদ্ধে, ধর্ম্ম-সংস্কারে, এবং সমাজের সংস্কারে রামমোহনের মত ব্যক্তি আর কেহ এ পর্য্যন্ত এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।" রামমোহনের সুখ্যাতি কিছুদিন ধরিয়া সেই পত্রিকায় যথানিয়মে বাহির হইতে লাগিল।

সেই পত্রিকা, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও বিস্তর যাইত—সুতরাং সেই সব দেশবাসিগণও—চক্ষে না দেখিয়াও—রাম-মোহনের শক্তি ও গুণগ্রামে মোহিত হইয়া তাঁহার বন্ধু হইয়া উঠিলেন।

শুধু কি তাহাই? তখনকার কলিকাতার 'ব্যাপ্‌টিষ্ট্‌ মিশন' নামক খৃষ্ট-ধর্ম্মসভার সর্ব্বপ্রধান 'এ্যাডাম' সাহেব রামমোহনের কাছে দীক্ষা লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

বাঙ্গালীর ইতিহাসে এ ঘটনা—অপূর্ব্ব এবং অদ্বিতীয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তিব্বতে বাসের কালে রামমোহনের প্রাণে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান জাগিয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম-সংস্কার করিবার পরে তিনি সমাজ-সংস্কার ব্রতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকদের দুঃখ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

সেই সময়ে হিন্দুদিগের প্রাচীন ভ্রান্ত-সংস্কারপূর্ণ সামাজিক কু-প্রথা 'সতীদাহ' তাঁহার প্রাণে বিষম শেলাঘাত করিল। তিনি সেই প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

যে সকল সতী সাধ্বী মহিমময়ী রমণী স্বামীর মৃত্যুতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন জীবন বলি দিতে চাহেন—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই—অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও—স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে জোর করিয়া বাঁধিয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। এ ব্যাপারে রামমোহন শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি বুঝিলেন যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিন্দু সমাজের ভিতর এত বড় একটা পৈশাচিক নৃশংস কার্য্য অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে, ইহা নরহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি ইংরাজ, কি ফরাসী, ওলন্দাজ, গ্রীক্, পর্টুগিজ প্রভৃতি সমস্ত বিদেশবাসী হিন্দুদের এই কু-প্রথা দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া চক্ষু বুজিয়াছেন—এ সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করিয়া বিস্তর পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। পাছে হিন্দুদের ধর্ম্মে এবং সমাজ-প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় সেই ভাবিয়া মহামতি ইংরাজরাজ এ বিষয়টা গ্রাহ্য করেন নাই। সুতরাং ধর্ম্মের নামে এই ভয়ানক পৈশাচিক নারীহত্যা সমানভাবে চলিয়া আসিতেছিল।

রামমোহন দেখিলেন যে জোর করিয়া পোড়াইয়া খুন করার চেয়ে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলে, সে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণে থাকিয়া অধিক উন্নতি করিতে পারে—অথচ এমন একটা নারীহত্যা ব্যাপার দেশ হইতে দূর হইয়া যায়। এ প্রথা রক্ষা করা ধর্ম্ম নহে—ইহা তুলিয়া দেওয়াই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। তখন তিনি এই বিষয় লইয়া লাট সাহেবদের নিকটে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সতীদাহ যে কি নৃশংস ব্যাপার, কি অধর্ম্মের ব্যাপার, সে সম্বন্ধে তিনখানি বই লিখিয়া ছাপাইয়া সেই সময়ের লাট সাহেবের পত্নী 'লেডি হেষ্টিংস্'কে উৎসর্গ করিলেন। তৎপরে সেই সকল পুস্তক প্রচার পূর্ব্বক দেশে মহা আন্দোলন বাধাইয়া দিলেন।

তাহা ছাড়া সেই বিষয় লইয়া তিনি সর্ব্বদা কাগজে লিখিতে লাগিলেন এবং যেখানে সেখানে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সে বিষয়ে রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি পড়িল, বড়লাট হেষ্টিংস্ বাহাদুর—এ বিষয়ের প্রতিকার করিবেন বলিয়া আশা দিলেন।

কিন্তু হেষ্টিংস্ সাহেব কিছুই করিয়া যাইতে পারিলেন না, সুতরাং রামমোহনও নিশ্চিন্ত হইলেন না। চারিদিক হইতে অসহায়া বিধবাদের আর্ত্তনাদে তাঁহার বুক কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল, আহার নিদ্রা দূরে গেল। দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে সতী-দাহ উঠাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

'হেষ্টিংস্' সাহেবের পরে 'লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক' বাহাদুর এদেশের লাট হইয়া আসিলেন। দেশে থাকিতেই তিনি খবরের কাগজে রামমোহনের শক্তি ও গুণের কথা পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার ইংরাজী পুস্তক সকল পড়িয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকর্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি এদেশে আসিয়া রামমোহনকে দেখিবার জন্য—তাঁহার সহিত পরিচয় করিবার জন্য—ডাকাইয়া আনিলেন।

রামমোহন এ সুযোগ ছাড়িলেন না, তিনি 'বেন্টিক' বাহাদুরকে সতীদাহের নৃশংসতা, অধার্ম্মিকতা, অত্যাচার প্রভৃতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া প্রতিকার চাহিলেন। 'বেন্টিক' বাহাদুর তখন আইন করিয়া চিরকালের জন্য সেই পাশবিক অত্যাচারের প্রথা বন্ধ করিয়া দিলেন। রামমোহন রায় তখন এক বিরাট সভা ক'রে—দেশের সকল লোকের পক্ষ হয়ে লাট সাহেববাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই-লেন। যতদিন এ দেশে ইতিহাস থাকিবে ততদিন রাজা রামমোহন রায়ের এই অক্ষয় কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কেবল তাহাই নহে—রমণী-পীড়নকারী কৌলিন্যপ্রথা, বালিকা-বিবাহ প্রথা, কুলীন কন্যাগণকে চিরকুমারী করিয়া রাখিবার প্রথা প্রভৃতি নানা প্রকার নিষ্ঠুর প্রথাসকল হিন্দুসমাজের বুক হইতে একেবারে তুলিয়া দিবার জন্যও তিনি প্রাণপাত চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা, পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগের ও লোক-হিতাকাঙ্ক্ষার গুণে হিন্দুরমণীগণের বহুকষ্ট চিরকালের জন্য দূরীভূত হইল। ধন্য রামমোহন! যাহা দশজন লোক দশটা জীবন লইয়া করিতে পারেন না—তাহা তিনি এক জীবনেই সমাধা করিলেন!

তারপর রামমোহন এ দেশে শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে মনযোগ দিলেন। তিনি বুঝিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ভিন্ন এ দেশের লোকের উন্নতি হইবে না, তখন এই বিষয় লইয়া রাজপুরুষদের কাছে অবিরত লেখা-লিখি ও আন্দোলন সুরু করিয়া দিলেন।

মহামতি ভারতবন্ধু 'ডেভিড্ হেয়ার সাহেব—রামমোহনের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্যে রামমোহনের সঙ্গে যোগ দিলেন, এই দুই মহাপুরুষের চেষ্টায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষার পথ প্রসারিত হইল।

কিন্তু তখনও দেশবাসী রামমোহনকে চিনিতে পারেন নাই,

তখনও বিধর্ম্মী বলিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার বিপক্ষ। তাই যখন রামমোহন এবং হেয়ার সাহেবের চেষ্টায় এদেশে সর্ব্বপ্রথম 'হিন্দুকালেজ' স্থাপিত হইল তখন,—বিধর্ম্মী বলিয়া তিনি যোগ দিলে পাছে দেশের অন্য কেহ এই বিদ্যামন্দির স্থাপনে যোগদান না করেন সেই ভয়ে—রামমোহন প্রকাশ্যে সে দিক ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে, গোপনে গোপনে হিন্দুকালেজ স্থাপন করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। এরূপ নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতধারী মহাপুরুষ কোন্ দেশে কয় জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?

তাহা ভিন্ন তিনি সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে আর একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। ৮০ জন ছাত্র এ স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। তারপর ডফ্‌সাহেব এদেশে আসিয়া একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিবার চেষ্টায় রামমোহনের সাহায্য চাহিলেন। রামমোহন, কায়মনোপ্রাণে সাহেবের সে মহৎ কার্য্যের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

আপনাদের ব্রাহ্মসমাজের গৃহ স্কুলের জন্য ছাড়িয়া দিলেন—'ডফ্‌স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন তিনি আর্থিক এবং শারীরিক সাহায্যে সর্ব্বপ্রকারে সেই ডফ্‌স্কুলের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রামমোহনের গুণে, চেষ্টায় ও সহায়তায় এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার পথ প্রথম প্রসারিত হইল।

তদ্ভিন্ন তিনি এদেশে এক নূতন ব্যাপার—বেদ-বিদ্যালয়—স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগকে বেদান্ত-দর্শনশাস্ত্র পড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। লোকে যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে উচ্চশিক্ষিত হইয়া মানুষ হইতে পারে তদ্বিষয়ে তিনি আত্মোৎসর্গ করিলেন। এমন মহাপুরুষ আর কে আছে ?

তখন দেশে পরসী ভাষাই প্রচলিত, সুতরাং লোক শিক্ষার জন্য পারসী ভাষার আলোচনাই আবশ্যক। এই ভাবিয়া রামমোহন 'আকবরী'

নাম দিয়া নিজে এক পারসী সংবাদপত্র প্রচার করিলেন—তাহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল, । সুতরাং যে যে উপায়ে দেশের লোকের উন্নতি হওয়া সম্ভব একা রামমোহন সেই সকল বিষয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া দিলেন।

লর্ড হেষ্টিংস্ পদত্যাগ করিলেন, লর্ড আমহার্ষ্ট এদেশে আসিবার পূর্ব্বে, লর্ড এ্যাডাম্‌স্ কিছু দিনের জন্য লাটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তাহাতে সেই সময়ের 'হরকরা' নামক সংবাদপত্র বিস্তর কটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার ফলে সে কাগজ বন্ধ হইয়া গেল, তাহার সহকারী সম্পাদককে পলাইয়া জেলের দায়ে আত্মরক্ষা করিতে হইল এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ পাইল। লাট-সাহেবের সভা হইতে আদেশ হইল যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম ভিন্ন কেহ আর কোন প্রকার সংবাপদপত্র বাহির করিতে পারিবে না।

রামমোহন দেখিলেন ইহাতে দেশবাসীর সর্ব্বনাশ হইল, শিক্ষা-বিস্তারের মূল নষ্ট হইল এবং স্বাধীন চিন্তা এবং লেখার স্রোত বন্ধ হইল। তিনি তখন এই বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির নিকটে আবেদন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফল না পাইয়া শেষে সম্রাট চতুর্থ জর্জ্জের কাছে পর্য্যন্ত দরখাস্ত করিয়া, প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তখনকার দিনে আদালতে ইংরাজ আর খৃষ্টিয়ান ভিন্ন অন্য কেহ জুরী হইতে পারিত না। ইহাতে দেশের লোকের বড় অসুবিধা হইল, বিস্তর বিচার-বিভ্রাট ঘটিতে লাগিল। রামমোহন এই বিষয় লইয়া বিলাতের মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত দরখাস্ত ও আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে অবশেষে এদেশের বিচারালয় সমূহে দেশীয় উপযুক্ত লোকেরা জুরী হইবার অধিকার পাইলেন।

ইহা ছাড়াও দরিদ্র কৃষকদের জন্য গবর্ণমেণ্টে বিস্তর আন্দোলন

ও লেখালেখি করিয়া রামমোহন অনেক বিষয়ে তাহাদের অনেক রকমের সুবিধা করিয়া দিলেন।

তাঁহার মত দরিদ্রের বন্ধু, দেশের বন্ধু, লোকহিতব্রতধারী, উদারচরিত্র, মহাপ্রাণ মহাপুরুষ আর কয়জন আছেন ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিলাত ভারতবাসীর পক্ষে একটা স্বপ্নরাজ্য। ঠাকুরমার মুখে শুনা উপকথার মত---এদেশের লোকের মনে, তাহার শিল্প বাণিজ্য, শিক্ষা, ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি একটা গৌরবময় অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যে আচ্ছাদিত বোধ হইত। তখন পর্য্যন্ত এদেশবাসী কেহ—সুদূর সমুদ্র-পারের সেই সোনার স্বপ্ন-রাজ্যে যাইবার কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারে নাই। রামমোহন সর্ব্ব প্রথমে সেই সোনার স্বপ্ন-রাজ্যে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিলেন।

বিলাত রাজার দেশ, সেখানে এদেশের সম্রাট থাকেন, এ দেশের ভাগ্য-বিধাতারা সেই দেশে থাকিয়া এখানকার শাসন-পালন কার্য্য পরিচালনা করেন। সেখানে যাইতে পারিলে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া, দরিদ্র ভারতের দুঃখের কাহিনী জানাইতে পারিলে নিশ্চয়ই এদেশের বিস্তর উপকার হইবে। দেশের দুঃখে কাতর-হৃদয়, পরহিতে আত্মত্যাগী মহাত্মা রামমোহন এই কারণে বিলাতে যাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

যাহার যেমন সাধনা—সিদ্ধিও তেমনই হয়। যিনি ঐকান্তিক চিত্তে যাহা চাহেন দয়াল ভগবান তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন। রাম-মোহনেরও বিলাত গমনের সুযোগ মিলিল।

সেই সময়ে দিল্লীর বাদসাহের সঙ্গে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' কতকগুলি বিষয় লইয়া অত্যন্ত গোলোযোগ চলিতেছিল। সেই সকল বিষয় মন্ত্রীসভায় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাহার মীমাংসা করাইবার জন্য বাদসাহ একজন সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত লোক খুঁজিতেছিলেন। তখন রাম-মোহনের মত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য ব্যক্তি এদেশে আর দুটি ছিল না। সুতরাং বাদসাহ রামমোহন রায়কে তাঁহার পক্ষ হইতে বিলাতে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। রামমোহনও আনন্দে বাদ্‌সাহের সেই আদেশ গ্রহণ করিলেন।

বাদসাহ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিলাতে পাঠাইলেন। ইংরাজী ১৮৩০ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে 'আল্‌বিয়ন' নামক জাহাজে রাজা রামমোহন সর্ব্ব প্রথম বিলাত-যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই বিলাতের লোকে রাজা রামমোহনের নাম শুনিয়া-ছিল এবং তাঁহার অশেষ গুণ ও শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। রাজা বিলাতে পৌছিলে বিস্তর সম্ভ্রান্ত সাহেব মেম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিলেন এবং অনেকে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে তাঁহাকে অতিথি স্বরূপে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় রাজা সকলকে ধন্যবাদ দিয়া, একটি হোটেলে গিয়া উঠিলেন।

সেই সময়ে সেই দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া আনন্দিত হইলেন; বিস্তর সম্ভ্রান্ত বড় লোক আপনাদিগকে ধন্য ভাবিলেন, দেখিতে দেখিতে রাজা রামমোহনের যশের গাথায় বিলাত ভরিয়া উঠিল।

সেই সময়ে বিলাতের মন্ত্রীসভায় 'রিফর্ম বিল' (সংস্কার আইন)

এর আন্দোলন চলিতেছিল। রাজা সেই মহাসভায় সেই সম্বন্ধে ইংরাজীতে এমন চমৎকার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন যে বিলাতবাসী সকলেই তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তৎপরে রাজা রামমোহনের আন্দোলন আলোচনা ও মন্ত্রীসভায় বহু তর্ক-বিতর্ক ও বাদানু-বাদের ফলে সেই 'সংস্কার আইন' পাশ হইল—তাহাতে এদেশের শ্রমজীবীদের অনেক দুঃখ কষ্ট দূর হইল—রাজা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া আনন্দিত হইলেন।

শুধু সেই কার্য্য করিয়াই বিলাতে তিনি নিরস্ত হইলেন না। যাহাতে এদেশের প্রজাদের উপর বেশী রাজকর না চাপিয়া বসে, যাহাতে প্রজাসাধারণ জমীদারদের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পায়, যাহাতে এদেশের লোক উচ্চশিক্ষিত হইয়া হাকিম হইতে পারে, যাহাতে এদেশের লোককে বেশী বেতনের বড় বড় রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দয়ায়, তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার চেষ্টায় ভারতবাসী এক্ষণে সেই সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে।

এইরূপে ধর্ম্মনীতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, পরম পণ্ডিত বলিয়া সমস্ত ইউরোপে রাজা রামমোহনের গৌরব প্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন সম্রাট স্বয়ং মন্ত্রীসভা হইতে তাঁহার বাদশাহ প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি —আপনাদের প্রদত্ত উপাধি বলিয়া মঞ্জুর করিলেন। এই সময় হইতে রামমোহন যথার্থই বিলাতের ঘর ঘর হইতে রাজ-পূজা লাভ করিতে লাগিলেন। এমন কি সেখানে সম্রাটের অভিষেক কালে—অভি-ষেক স্থলে বসিবার জন্য তিনি মহা সম্মান ও গৌরবের আসন প্রাপ্ত হইলেন।

তাহার পরে তিনি ফ্রান্স দেশে বেড়াইতে গেলেন। তাঁহার পরম বন্ধু ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাও তাঁহার সঙ্গে সহচর হইয়া গমন করিলেন। সেখানে তৎকালের ফরাসী-সম্রাট 'লুইফিলিপ্' স্বয়ং

তাঁহার পরম আদর অভ্যর্থনা করিয়া একত্রে আহার করিলেন। এ মহা সম্মান অদ্যাবধি আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই।

এইখানে ফরাসী মহাকবি 'টমাস্ মুরে'র সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল। কবিবর আপনার ডায়েরীতে রাজা রামমোহনের অশেষ পাণ্ডিত্য, শক্তি, প্রতিভা এবং গুণগ্রামের বিষয় লিখিলেন।

সেখান হইতে আবার বিলাতে ফিরিয়া আসিয়া রাজা হেয়ার সাহেবের বাড়ীতে রহিলেন।

সেই সময়ে বিলাতের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সমাজে একটা ভ্রান্ত সংস্কার ছিল যে, মানুষ মাত্রেই পাপ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। রাজা তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভার বলে, বিদেশী ধর্ম্ম-সমাজের সেই মত খণ্ডন করিয়া দিলেন, তাহাতে বিখ্যাত বিখ্যাত পাদরীগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'রেভারেণ্ড্ ডেভিড্সনে'র সঙ্গে রাজার এমন বন্ধুত্ব হইল, পাদরী সাহেব তাঁহাকে এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলেন, যে তাঁহার পুত্রের 'নামকরণ'-উৎসবের সময়ে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে আপন পুত্রের নাম রাখিলেন—'রামমোহন'।

বিলাতে থাকিবার কালে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ধনী বংশের সহিত রাজার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ব্রিষ্টলের 'ক্যাসেল' বংশের সহিতও তাঁহার সেইরূপ বন্ধুত্ব হয়। 'ক্যাসেল' মস্ত ধনী সদাগর ছিলেন—তিনি বিস্তর ধন-সম্পত্তি, অট্টালিকা এবং কুমারী কন্যা রাখিয়া মারা গেলেন। কুমারী ক্যাসেলের এবং ডাক্তার কার্পেণ্টারের অনুরোধে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম লাভের কারণে তিনি ব্রিষ্টলে—কুমারী ক্যাসেলের বাড়ীতে গিয়া রহিলেন।

'ব্রিষ্টল' লণ্ডনের প্রান্তবর্ত্তী মনোহর পল্লীগ্রাম—সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। রাজা রামমোহন সেখানে গিয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন। সেখানেও তাঁহার বিস্তর বন্ধু মিলিল।

সকলকে অমায়িক ব্যবহারে তিনি আপ্যায়িত করিলেন। এমন কি সেই পল্লীগ্রামের দরিদ্র কৃষকমণ্ডলীও রাজার বন্ধুত্বলাভে বঞ্চিত হইল না। রাজা পরমানন্দে কৃষকদের কুটীরে কুটীরে বেড়াইয়া তাহাদিগকে ধন্য করিতে লাগিলেন।

সেইখানেই কার্পেণ্টারের কন্যা কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে রাজার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল। তিনিই কুমারীর প্রাণে লোকহিত-ব্রতের বীজ বপন করিয়া দিলেন। তাহার ফল ভোগ করিয়া এক সময়ে ভারতবাসী ধন্য হইয়াছেন।

সেইখানে, রাজা রামমোহনের বক্তৃতা শুনিবার জন্য, একদিন এক বৃহৎ সভা হইল—সেই সভায় দেশের সমস্ত ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সমবেত হইয়া রাজার বক্তৃতা শুনিল। সকলেই মুগ্ধ হইয়া 'ধন্য' 'ধন্য' করিতে করিতে গৃহে গেল—চিরদিনের মত তাহাদের হৃদয়ে রাজার পুণ্যমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া রহিল।

কিন্তু হায়! রাজা রামমোহনের ভাগ্যে উহাই শেষ সভা হইল। পরদিন হইতে তাঁহার জ্বর হইল এবং দিনে দিনে সেই জ্বর বাড়িয়া সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল এবং শেষে জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইল।

কুমারী ক্যাসেল, কুমারী কার্পেণ্টার, কুমারী হেয়ার প্রভৃতি মহিলারা মাতার মত স্নেহে, কন্যার মত যত্নে অহোরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বড় বড় ডাক্তার দেখাইলেন, ভাল ভাল ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু হায়! কোন ফল হইল না। ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় দেড়টার সময়ে তাঁহার মৃত্যু-লক্ষণ দেখা দিল। তৎপরে রাত্রি ২টা ২৫ মিনিটের সময় মহাপুরুষ এ জন্মের মত চক্ষু বুজিলেন। দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা যেন পিতৃ-শোক পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেইখানে

কুমারী ক্যাসেলের একটি সুন্দর উদ্যানে তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা ও সমারোহের সহিত সমাধিস্থ করা হইল।

তৎপরে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে গেলেন, তখন তিনি রাজার পুণ্যময় দেহ সেখান হইতে 'নস্‌ভেল' নামক স্থানে আনিয়া সমাধিস্থ করিলেন এবং সেই সমাধিক্ষেত্রের উপরে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

আমরা অধম বাঙ্গালী-জাতি, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি না, হাতে পাইয়াও রত্ন চিনি না, কাছে থাকিয়াও দেবতার পূজা করিতে পারি না। তারপরে চিরদিন অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতির সম্মান করিয়া ধন্য হই।

সম্পূর্ণ